মুক্তিযুদ্ধ ও ভালোবাসার ছোঁয়ায় মোড়ানো ‘নিঝুম অরণ্যে’

মাসুম আওয়াল

টানা নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে আমাদের এই বাংলাদেশ। তরুণ প্রজন্ম সেই যুদ্ধ দেখেনি, এই কাহিনী জেনেছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ে, মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা দেখে। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে নির্মিত হয়েছে অনেক মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা। বছর কয়েক আগে নির্মিত তেমনই একটি চলচ্চিত্রের নাম ‘নিঝুম অরণ্যে’। রঙবেরঙ এর নিয়মিত আয়োজনের এবার আমার তুলে ধরতে চাই সেই চলচ্চিত্রের কথা।

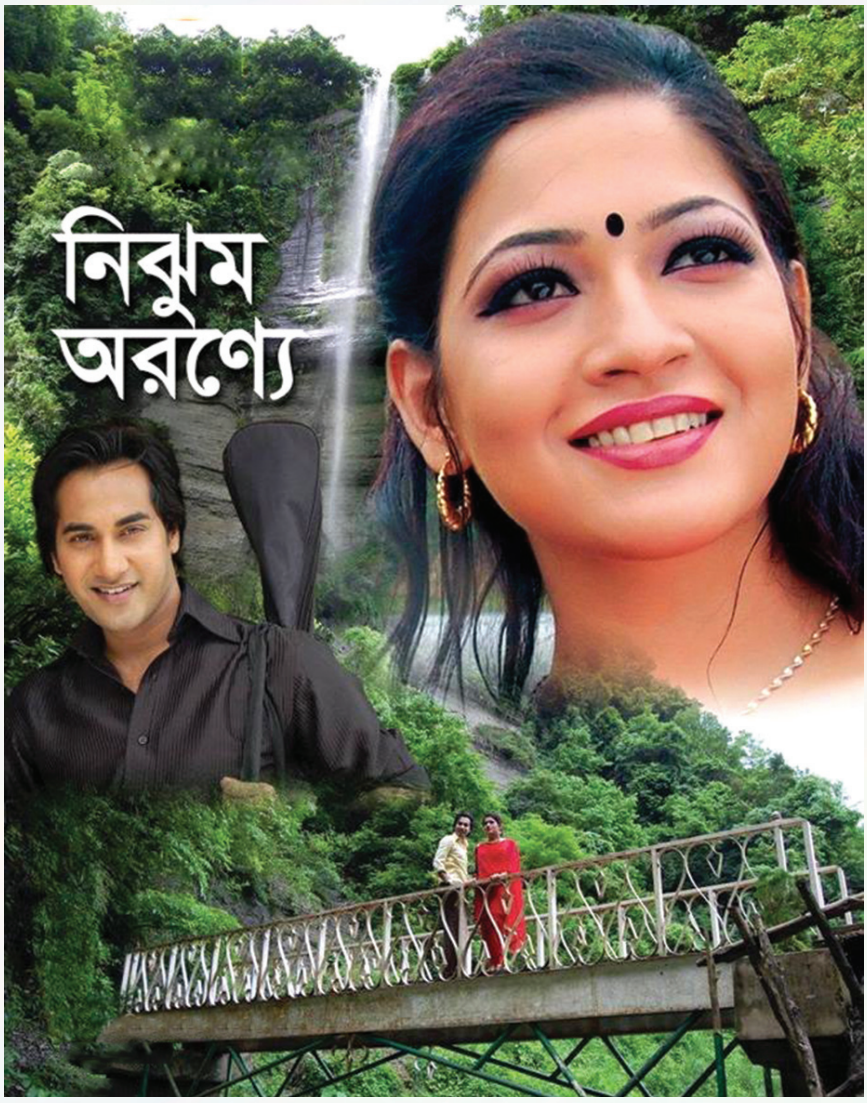

মুক্তির আলোয়

‘নিঝুম অরণ্যে’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিন প্রজন্মের তারকারা। সাদামাটা গল্পের মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা এটি। যার এক অংশ জুড়ে আছে ভালোবাসা। বেশ ক'টি মিষ্টি কথা ও সুরের গানও আছে এতে। ৩৫ মিমি ফিল্মে নির্মিত সিনেমাটি মুক্তির আলোয় আসে ২০১০ সালের ১৪ এপ্রিল। বর্তমাতে চ্যানেল আইয়ের ইউটিউব চ্যানেল থেকে ঘরে বসেই দর্শক উপভোগ করতে পারবেন এটি।

আড়ালের মানুষেরা

‘নিঝুম অরণ্যে’ সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন মুশফিকুর রহমান গুলজার। সিনেমাটি সম্পাদনা করেন এ কে আজাদ। নৃত্য পরিচালক ছিলেন আব্দুর রহিম। রূপসজ্জায় ছিলেন খলিলুর রহমান। চিত্রগ্রহণে ছিলেন জেড এইচ মিন্টু। সিনেমাটির কাহিনী চিত্রনাট্য সংলাপ লিখেছেন মাহবুব জামিল। সিনেমাটি প্রযোজনা ও পরিবেশনায় ছিলো ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড।

সিনেমার গান

সিনেমাটির সংগীত পরিচালনা করেছেন সৈয়দ সাবাব আলী আরজু ও ইমন সাহা। গানগুলো গেয়েছেন সাবিনা ইয়াসমিন, নাহার জামিল, কুমার বিশ্বজিৎ ফাহমিদা নবী এবং এস আই টুটুল। লিখেছেন মোহাম্মদ জাকারিয়া, ফকির মুশফিকুর রহমান গুলজার। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও লালনগীতিও ব্যবহার করা হয়েছে সিনেমায়।

কী আছে সিনেমায়

প্রাকৃতিক আবহের মধ্যে দিয়েই শুরু হয় কাহিনী। শুরুতেই দেখা যায় গাছের সঙ্গে দোলনা ঝোলানো আছে। সেই দোলনায় বই পড়ছেন নায়িকা বাঁধন। গ্রামের বাড়ির ঠিকানায় ভাইয়ের কাছে সে একটা চিঠি লিখে পাঠায়। পরের দৃশ্যে দেখা যায় আবুল হায়াতকে। তিনি একটা চেয়ারে বসে চা পান করছেন। তার হাতে একটা চিঠি এসে পৌঁছায়। না বাঁধনের পাঠানো চিঠি নয় এটা। তারা এক বাসাতেই থাকে। বাবা-মেয়ে। বাঁধনের বিয়ের তোড়

জোড় শুরু করেছেন বাবা। এদিকে কন্যা এখনই বিয়ে করতে চান না। সিনেমায় আবুল হায়াত একজন স্কুল শিক্ষকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তার চরিত্রটির নাম মিনহাজ। অন্যদিকে বাঁধনের চরিত্রটির নাম নীলা। ১৯৭১ সালে এই স্কুল শিক্ষক মিনহাজের জীবনে ঘটে গেছে অনেক মর্মান্তিক ঘটনা। সব সময় সেই স্মৃতি তাকে তাড়া করে ফেরে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ছোট্ট এ পরিবারটিতে নেমে আসে আঁধার। পাকবাহিনির আক্রমণ থেকে বাঁচতে রাকিব তার স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে যায়। স্ত্রী ও শিশু কন্যাকে পিতা এবং একমাত্র ছোটবোন নীলার কাছে রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় মিনহাজ। যুদ্ধ যখন শেষের দিকে তখন পরিবারের কাছে খবর আসে, যুদ্ধে রাকিব শহীদ হয়েছেন। কিছুদিন পর রাকিবের স্ত্রী মিলিকে তার বাবা অন্যত্র বিয়ে দেয়। যুদ্ধ শেষে বাড়িতে ফিরে আসে রাকিব। তারপর ঘটনা মোড় নেয় ভিন্ন দিকে।

সিনেমার জুটি

জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী আজমেরী হক বাঁধন ও সজল। বেশ কিছু নাটকে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন। তবে প্রথম জুটি বেঁধে বড় পর্দায় অভিনয় করেন নিঝুম অরণ্যেতে। এখানে দেখা যায় কাকতালীয় ভাবেই তাদের দেখা হয় ট্রেনের এক কামরাতে। মুখোমুখি বসে চট্টগ্রামে আসেন তারা। সিনেমায় সজলের চরিত্রটির নাম সৈকত। একটি ছদ্মনামে লেখালেখিও করে সে। সিনেমায় দেখা যায় বড় ভাই রাকিবের বাসায় বেড়াতে আসে নীলা। কয়েকদিন এখানেই সময় কাটাবে সে। রাকিবের বাড়ির ছাদে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে থাকে নীলা। ঠিক এই সময় এসে উপস্থিত হয় সৈকত। সৈকতকে দেখে চমকে যায় নীলা। কারণ ট্রেনে মুখোমুখি বসেছিল তারা। এই লোক তার ভাইয়ের পরিচিত হতে পারে সে ভাবতেও পারেনি। নীলা গান থামিয়ে দেয়। সৈকত এখানে চাকরি করে কাগজ কলে। রাকিব সৈকতকে বলে একটা লালনগীতি গাইতে। সে খুব ভালো গায়। এরপর গান ধরে সৈকত। অন্যরকম এক পরিবেশ তৈরি হয়। পরের দিন কর্ণফুলী নদীতে বেড়াতে যায় তারা। নৌকা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অনেক কিছু দেখায় রাকিব। কাছাকাছি এসেই সৈকত ও নীলার ভিতর ভালোলাগা তৈরি হয়। রাকিব সেটা বুঝতেও পারে। বোনের সঙ্গে সৈকতের সম্পর্কতে সে খুশিই হয়। কারণ সৈকতকে সে বেশ পছন্দই করে। এক সময় নীলাকে রাকিব প্রশ্ন করে সৈকতকে কেমন লেগেছে। নীলা বলে, 'প্রকৃতির মতোই প্রাণচঞ্চলে ভরা এক দারুন মানুষ সৈকত।' এভাবেই এগিয়ে যেতে থাকে সৈকত-নীলার সম্পর্ক। একসময় এই সম্পর্কের মাঝেও ঝড় আসে। হঠাৎ করেই সৈকতের প্রতি ভুল ধারণা তৈরি হয় নীলার। সৈকতের বাসার টেবিলের ওপর একটি চিঠি পায় সে। যে চিঠিটি অন্য একজনকে লেখা। সৈকতকে ভুল বুঝে ফিরে আসে নীলা। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরে আসতে

'নিঝুম অরণ্যে' সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন মুশফিকুর রহমান গুলজার।

৩৫ মিমি ফিল্মে নির্মিত 'নিঝুম অরণ্যে' সিনেমাটি মুক্তির আলোয় আসে ২০১০ সালের ১৪ এপ্রিল।

চায়। এক সময় তার ভাই রাকিব সৈকতের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করে এবং নীলার ভুল ভাঙিয়ে দেয়। নীলা জানতে পারে তার প্রিয় লেখক আর কেউ নয় এই সৈকত। ছদ্মনামে এতদিন যার লেখা সে পড়ে এসেছে সে। যে চিঠিটি পড়েছিল নীলা সেটা সৈকতের একটি গল্পের চরিত্র। তাদের সম্পর্ক ঠিক হয়ে গেলো ঠিকই কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা বড় ভাই রাকিব হঠাৎ দুর্ঘটনার মুখোমুখি হলো।

মুক্তিযোদ্ধা রাকিব

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের লড়াকু সৈনিক রাকিব। সে চট্টগ্রামে সরকারি চাকরি করে। এখানে সরকারি কোয়াটারে থাকে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সে হারিয়ে ফেলেছে তার পা। হারিয়ে গেছে তার প্রিয়জন। হারিয়েছে তার একটা পা। এখন কৃত্রিম পায়ে এসে চলাফেরা করে সে। একদিন নীলার কাছে তার ভাইয়ের গল্প শুনতে চায় সৈকত। ঘটনাটি এমন, 'মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। রাকিব তার স্ত্রী মিলিকে এবং একমাত্র কন্যা সন্তান পিয়ালকে তার বাবা এবং ছোট বোনের কাছে রেখে মুক্তিযুদ্ধে চলে যায়। মুক্তিযুদ্ধ যখন শেষের দিকে ঠিক সেই সময় একজন মুক্তিযোদ্ধা আসে মিনহাজ সাহেবের বাড়িতে এবং মিনাজ সাহেবকে জানায় তার ছেলে রাকিব মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে। এরপর কেটে যায় অনেকদিন। একদিন মিলির বাবা মিলিকে নিতে আসে এবং নিয়ে চলে যায়। মেয়েকে বিয়ে দেয় অন্য একজনের সঙ্গে। কন্যা পিয়াল তার মায়ের কাছেই থাকে। এর বেশ কিছুদিন পরে রাকিব ফিরে আসে। ফিরে এসে জানতে পারে তার স্ত্রী মিলির অন্যখানে বিয়ে হয়ে গেছে। সে লুকিয়ে লুকিয়ে তার মেয়েকে দেখতে যায়। একসময় সরকারি চাকরি নিয়ে সে চলে আসে চট্টগ্রামে। কিন্তু কোনোভাবেই নিজের স্ত্রী ও সন্তানের কথা ভুলতে পারে না। সারাক্ষণ তাদের কথা মনে করে চোখের পানি ফেলে। মেয়ের প্রতি জন্মদিনে ঢাকায় আসে। মেয়েকে লুকিয়ে গিফট পাঠায় এবং ফিরে আসে। একদিন মিলির লেখা একটা চিঠি আসে রাকিবের ঠিকানায়। রাকিব চিঠি পড়ে। রাকিবের কাছে ক্ষমা চায় মিলি। জানায়, মেয়ে স্কুলের অনুষ্ঠানে গান গাইবে। তাকে সেখানে আসার আমন্ত্রণ জানায়। এরপর রাকিব ছুটে যায় ঢাকায়। মেয়ে দেশের গান গাইতে থাকে, সে গান শুনে মুগ্ধ হয়। তাদের সঙ্গে না দেখা করেই ফিরে আসে আবার চট্টগ্রামে। এরপর বেশ কিছুদিন কেটে যায়। একদিন সিঁড়ি থেকে হঠাৎ করে নিচে পড়ে যায়। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসক জানান মুক্তিযুদ্ধের সময় রাকিবের পা উড়ে যায়। সে সময় তার একটা কিডনিও নষ্ট হয়ে যায়। অন্য কিডনিটিও এখন ড্যামেজ। অবশেষে হাসপাতালে মৃত্যু হয় রাকিবের। শেষ পর্যন্ত আর স্ত্রী সন্তানের সঙ্গে দেখা হয় না তার।

সিনেমা নিয়ে কিছু কথা

সব মিলিয়ে সিনেমাটির গল্পে নানা রকমের বাঁক আছে। গল্পটি অসাধারণ। দেখতে শুরু করলে না শেষ করে উঠতে পারবেন না। কিন্তু সিনেমার ক্যামেরা রোলিং কিংবা কালার গ্রেডিংয়ে যদি আরো কিছুটা যত্নবান হওয়া যেত তাহলে হয়তো সিনেমাটি আরো হৃদয়গ্রাহী হতে পারত। আর দশটি সাধারণ মুক্তিযুদ্ধের সিনেমার মতো গতানুগতিক গল্প নয় এটি। এখানে মুক্তিযুদ্ধের একই দৃশ্য বারবার দেখানো হয়নি। পুরানো ফুটেজ ব্যবহার করা হয়নি। পরিচালক বর্তমান সময়েরই গল্প বলছেন, যে গল্পের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ।

শেষকথা

পরিচালক দারুণভাবে মুক্তিযুদ্ধের একটি গল্প বলার চেষ্টা করেছেন এ সিনেমার। বেশকিছু মেসেজও দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বলার চেষ্টা করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের মনের কথা। তাদের স্বপ্নের কথা। একজন মুক্তিযোদ্ধা দেশকে ভালোবেসে তার জীবন বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করেননি। কারও হাত হারিয়েছে, পা হারিয়েছে, চোখ হারিয়েছে। কিন্তু হাসিমুখে তারা এসব মেনে নিয়েছেন দেশের জন্য। সেই দেশের কথা সবাই যখন ভাববে তখন মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মা শান্তি পাবে। একটি দৃশ্যে দেখা যায়, রাকিব সাহেবের কাছে এক লোক আসে তার কাজের বিল নেওয়ার জন্য। সে রাকিব সাহেবকে ঘুষ দিতে চায়। রাকিব সাহেব রেগে যান। সঠিকভাবে না হলে তিনি এই কাজ কাজের বিল পরিশোধ করবেন না বলে জানান। ঘুষ দিতে চাওয়ার জন্য লোকটিক বকাঝকা করেন। অবশেষে লোকটি বেরিয়ে যায়, আরও কিছুদিন সময় চেয়ে নিয়ে। বলেন, তিনি এবার সঠিকভাবে কাজ করে তবেই বিল নিতে আসবেন। দেশকে তিনিও ফাঁকি দিতে চান না। এগিয়ে যাক আমাদের বাংলাদেশ। মুক্তিযোদ্ধাদের সততাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তরুণ প্রজন্মকেই নিতে হবে।